প্রতিক্রিয়া

জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বিতর্ক : অর্ণবের উদ্দেশ্যে কিছু কথা

অভিজিৎ রায়

আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত সংক্রান্ত অর্ণব দত্তের হৃদয়গ্রাহী প্রস্তাবটি আমার পক্ষে মানা সম্ভব হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথকে আমরা, মানে বাংলাদেশের বাঙালীরা কখনই ‘বিজাতীয়’ ভাবি না, বরং আপন সংস্কৃতির অংশই মনে করি (আমি অবশ্য এখানে ‘আমরা’ বলতে পাকিস্তান প্রেমিক রাজাকার, আলবদর কিংবা তৌসিফ বিহারী অথবা এন.এফ.বির ‘হিরো’ মোঃ আবদুল্লাহদের গোনায় ধরছি না)। ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি শুনলে আমাদের কখনই কিন্তু পরদেশীয় বা ভিন দেশীয় মনে হয় না, বরং মনে হয় এটি আত্মার আত্মীয়- অন্যদের কথা জানি না, অন্ততঃ আমার কানে তো বেজে ওঠে বাংলাদেশের শ্যামলিমা গাঁয়ের মোঠো সুরই। আর তা ছাড়া এটি ভুলে গেলে চলবে না যে কবিগুরু তার জীবনের একটা বড় সময়ই কিন্তু বাংলাদেশে কাটিয়েছিলেন। কুষ্টিয়ার শিলাইদহে কুঠিবাড়ীর কথা কে না জানে! দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা বাংলাদেশে এলে তাদের অনেকের কাছেই কুঠিবাড়ী একটি দর্শনীয় স্থান হিসবে গন্য হয়। এ বাড়ীতেই কবিগুরু তার স্ত্রী মৃনালিনী দেবীকে নিয়ে তার জীবনের সুন্দরতম মূহূর্তগুলো পার করেছিলেন। কাজেই ভৌগলিকভাবে পৃথিবীর যে অংশটাকে আমরা ‘বাংলাদেশ’ হিসেবে আজ অভিহিত করি, সে অংশটির সাথে কবিগুরুর সম্পর্কটি একেবারে ফেলনা নয়। অবসর সময়ে তার রাজবাড়ীর পাশে পদ্মা নদীতে কবি নৌবিহার করতেন আর অনবদ্য সব কবিতা আর গান লিখতেন, যা রবীন্দ্র সাহিত্যকে উজ্জ্বল করেছে।

কাজেই, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রবিঠাকুরকে স্রেফ ‘বিজাতীয়’ কবি ধরে নিয়ে হটিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টাটি শুধু হাস্যকর নয়, অনেকাংশে জাতিবিদ্বেষপ্রসূতও বটে। আমি আশ্চর্য হলাম, কারণ এই মনোভাবটি এবারে মোঃ আবদুল্লাহদের মুখ দিয়ে বেরোয়নি, বেরিয়েছে অর্ণব দত্তের মুখ দিয়ে, যিনি মনে প্রাণে আধুনিক ও প্রগতিশীল। আর তাছাড়া অর্ণব তাঁর লেখাটিতে যেভাবে ছত্রে ছত্রে রবীন্দ্রনাথকে কখনও ‘ভারতীয় কবি’ কখনওবা ‘ভারতীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাসী’ কবি বানিয়েছেন তাও আপত্তিকর। সবচেয়ে আপত্তিকর এবং হাস্যকর হয়েছে কুদ্দুসখানের উদ্ধৃতি দিয়ে রবিঠাকুরকে ‘ভারতীয় জাতীয়বাদী’ বানানো। যারা রবীন্দ্রনাথের লেখালিখি এবং দর্শনের সাথে পরিচিত তারা সবাই জানেন জাতীয়তাবাদ নামের ধারণাটির প্রতিই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। এ জন্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে কবিগুরু উচ্চারণ করেছিলেন - ‘সঙ্কীর্ণ জাতিপ্রেমই স্বার্থপরতার সূত্রপাত, আর স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।’ ১৯১৬ সালে জাপান ও আমেরিকায় প্রদত্ত কিছু ভাষণে কবিগুরু ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক শক্তির আড়ালে লুকিয়ে থাকা সাম্রাজ্যবাদ

আর যুদ্ধোন্মাদনার মুখোশ উন্মোচনে প্রয়াসী হন এই বলে - 'The nation with all its paraphernalia of power and prosperity... cannot hide the fact that the Nation is the greatest evil for the Nation.... Nationalism is a great menace'। (এ নিয়ে আমার লেখা 'যুক্তির আলোয় দেশের ভাবমূর্তি ও দেশ প্রেম' এবং 'দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহর' প্রবন্ধ দুটি দেখুন) তারপরও যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই রবিঠাকুরের একটিই পরিচয়, উনি স্রেফ 'ভারতীয় কবি', তাতেই বা কী মহাভারত অশুদ্ধ হল? পৃথিবীর অনেক দেশের জাতীয় সঙ্গীতই 'বিজাতীয়' কবি বা গীতিকারদের দিয়ে লিখিত হয়েছে - এ দৃষ্টান্তও কিন্তু বিরল নয়! যেমন জার্মানীর জাতীয় সঙ্গীতটি রচনা করেছেন অস্ট্রিয়া নিবাসী সঙ্গীত নির্মাতা ফ্রা জোসেফ হাইডেন। ভ্যাটিকান সিটির জাতীয় সঙ্গীতটি লিখেছেন ভিনদেশী একজন ফরাসী কম্পোজার। কাজেই রবিঠাকুর যেহেতু 'আমাদের (ভারতীয়) কবি' অতএব 'তোমরা (বাংলাদেশীরা) উনার গান জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না' - এ ধরনের 'আত্মকেন্দ্রিক' মনোভাব কি প্রকারান্তরে অর্ণব দত্তের মনের সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ করছে না? অর্নবকে বিষয়টি আরেকবার ভেবে দেখতে বলি।

রবীন্দ্রনাথ যখন বেঁচে ছিলেন তখন আমাদের উপমহাদেশের ভৌগলিক (রাষ্ট্রীয়) সীমারেখাটা কিন্তু আজকের দিনের মত ছিলো না। কাজেই রবীন্দ্রনাথ 'ভারতীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাসী' নাকি 'বাংলাদেশী ভাবাদর্শে' বিশ্বাসী এ নিয়ে অহেতুক তর্কে মাতা নিতান্তই অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথ যদি ভারতীয় হন, তবে নজরুলকেই বা কি হিসেবে বাংলাদেশের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী কবি হিসেবে ভাবা যায়? নজরুল তার জীবনের প্রায় পুরো কর্মক্ষম সময়টাই ভারতে কাটিয়েছিলেন। নজরুল মুলতঃ লেখালিখিতে সক্ষম ছিলেন ১৯৪২ সালের জুলাই পর্যন্ত, তার পর তো অসুস্থই হয়ে পড়লেন, হয়ে গেলেন বোধহীন, বাকহারা। কাজেই শেষ বয়সে নজরুলকে টেনে হিঁচরে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হলেও কোন ক্রমে 'বাংলাদেশী ভাবাদর্শে' বিশ্বাসী কবি হিসেবে ভেবে আনন্দিত হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু তারপরও যে যুক্তিতে নজরুলকে বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি' হিসেবে সম্মানিত করা হয়েছে, ঠিক সে ধরনের যুক্তিতেই রবিঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত করা হয়েছে। আমি তো এর মধ্যে কোন সমস্যা দেখিনা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য সুনীল, সত্যজিত থেকে শুরু করে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক বা তাদের পুর্বপুরুষেরা এই পূর্ববঙ্গ নিবাসী ছিলেন। তাতে কি ভারতে মাইগ্রেশনের পর তাদের সন্মানহানি ঘটেছে? যদি তা না হয়, তবে রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশ থেকে জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতার সন্মানে সম্মানিত করলেই বা অসুবিধা কি? হলেন ই বা তিনি অর্ণবের যুক্তি অনুযায়ী 'ভারতীয়'!

রবিঠাকুর কিংবা নজরুল দু জনেই মনে প্রাণে বাঙালী, দু জনেই বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছেন ঢের। তবু মোঃ আবদুল্লাহ'র মত বাংলাদেশী মোল্লারা কেন নজরুল সম্বন্ধে নিরব থাকেন,

আর কেবল রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আর জাতীয় সঙ্গীত নিয়েই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আর শরীর দুলিয়ে অযথা বিতর্ক তৈরী করেন তা বোঝা দুষ্কর নয়। কারণটি শিশুও বুঝবে। তাদের দৃষ্টিতে নজরুল হচ্ছেন পাক্কা মুসলমান (যদিও মোল্লারা ভুলে যান নজরুলের অনেক কবিতা গানেই নাস্তিক্যবাদের প্রভাব আছে, এমনকি আছে ভগবানের বুকে পদচিহ্ন এঁকে দেবার অঙ্গীকারও) - কাজেই খাঁটি বাংলাদেশী, আর রবিঠাকুর হচ্ছেন হিন্দু (যদিও তিনিও প্রথাগত হিন্দু নন, জন্মেছিলেন ব্রাহ্ম পরিবারে) - কাজেই খাঁটি ভারতীয়। কাজেই হটাও রবীন্দ্রনাথ, হটাও সোনার বাংলা, হটাও জয় বাংলা; কারণ ওগুলো হিন্দুয়ানী কালচার। ব্যাস ওটাই শেষ কথা। ভারতীয় হিন্দু কবিকে হটানোর জন্য জিয়া-মোস্তাকদের উত্তরসূরী মোল্লাদের এই সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্প ছড়ানো বিভ্রান্তিকর যুক্তিটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু এর উলটো টা? উল্টোটাও বিরল নয়। অনেক হিন্দু 'কুলীন বাঙালী' আছেন যারা বাংলাদেশের মুসলিম অধিবাসীদের 'বাঙালী' দিসেবেই গ্রহণ করেন না। শরৎচন্দ্র একবার একটি লেখায় ফুটবল খেলার বর্ণনা দিয়েছিলেন এই বলে - 'খেলা হইবে বাঙালী বনাম মুসলমানে'। মুসলমানরাও যে 'বাঙালী হইতে পারে', এই বোধটুকু 'উন্নাসিক' শরৎ চন্দ্রের মাথায় আসেনি।

শরৎ বাবুর উন্নাসিকতা কি শেষ পর্যন্ত অর্ণব দত্তের ঘারেও ভর করলো? মনে তো হয়। অর্ণব তার সাম্প্রতিক একটি লেখায় বলেছেন বাংলাদেশের লেখকরা ইংরেজীতে লিখছেন না বলে কেউ তাদের চিনছে না। তিনি নিজেও নাকি দু মাস আগে হুমায়ূন আহমেদ বা ইমদাদুল হক মিলনের নাম জানতেন না। এবারের শারদীয় সংখ্যায় 'লিলূয়া বাতাস' পড়ে নাকি জেনেছেন। তিনি আরো বলেছেন লেখা পড়ে কেবল ভাষাটাই বুঝেছেন, ভাবটি বোঝেন নি। কিছু মনে করবেন না অর্ণব বাবু, আপনার এ বালখিল্য যুক্তি মেনে নিতে পারছি না। হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন সহ বাংলাদেশের লেখক লেখিকা, গল্পকার, ঔপন্যাসিকদের নাম আপনি জানতেন না, তারা ইংরেজীতে লিখছেন কি লিখছেননা বলে নয়, এর কারণ আপনাদের 'গন্ডীবদ্ধ মানসিকতা'। আমরা বাংলাদেশবাসীরা কিভাবে ছোট বেলা থেকে শীর্ষেন্দু সুনীল পড়ে বড় হয়েছি বলুন? শীর্ষেন্দু সুনীলেরা তো আর ইংরেজীতে লিখছেন না। বাংলাদেশে খুঁজলে অনেককেই পাওয়া যাবে যারা শীর্ষেন্দু, সুনীল, শঙ্করদের লেখাই কেবল পড়েন না, তাদের সমস্ত বই সংগ্রহে রাখেন। এমনকি বাংলাদেশে না পাওয়া গেলে ভারত থেকে নিয়ে এসে হলেও। সেই আগ্রহটুরই অভাব দেখা যায় আপনাদের মধ্যে। কবে কখন আপনাদের কোলকাতার 'শারদীয় সংখ্যায়' এক হুমায়ূন আহমেদের লেখা বেরুবে, তারপর আপনি তাকে চিনবেন, এর চেয়ে বড় 'গন্ডীবদ্ধ জীবন' আর কি হতে পারে? এখন তো ইন্টারনেটেই সব কিছু পাওয়া যায়। চিন্তা করে দেখুন - আনন্দবাজারের শারদীয় সংখ্যা পড়বার পাশাপাশি প্রথম আলো ঈদ-সংখ্যা পড়বার আগ্রহটিও যদি আপনার থাকতো, তবে অনেক আগেই বাংলাদেশের লেখকদের চিনতে পারতেন। বাংলাদেশের লেখকদের 'ভাব বুঝতে' আপনার ঘামও ছুটতো না। আমরা কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ভারতীয় লেখকদের ভাব বুঝতে পেরেছি, এই বাংলাদেশে থেকেও। কোলকাতার লেখকেরা (সবাই নন) ইচ্ছায় হোক

অনিচ্ছায় হোক প্রায়শঃই বাংলাদেশের লেখকদের নামের বানান ভুল লেখেন, বিকৃত করেন। আপনাদেরই এক স্বনামধন্য কবি এই সেদিন ফরহাদ মজহারকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন, অথচ তাঁর নামের শুদ্ধ বানানটি কি তা জানবার তাগিদ অনুভব করেন নি। এর আগে আমি একবার এগুলো উল্লেখ করে আপনাদের বিরাগভাজন হয়েছিলাম। অথচ দেখুন, আমার অনুযোগকেই সত্য প্রমাণ করে আপনি এবং আরেকজন সদস্য দুজনই আমাদের ফোরামে সাদ কামালীর রবীন্দ্র-সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে দু'দুবার সাদ কামালীর নাম ভুল ভাবে লিখলেন, একবার একজন লিখলেন সাদ **কামলি**, আরেকবার আরেকজন **সাদা** কামালী ইত্যাদি। এগুলোকে কিন্তু ব্যতিক্রম হিসেবে দেখলে চলবে না। দেশের বাইরে এসে রীতিমত হোচট খেয়েছি কোলকাতা থেকে আসা বহু ভারতীয় বাঙালীদের সাথে কথা বলতে গিয়ে আর তাদের বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানার দুরাবস্থা দেখে। অনেকেই একুশে ফেব্রুয়ারী কি তা তারা জানেন না, এমনকি তারা অবাক হয়েছেন শুনে বাংলাদেশেও পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান হয় কিংবা রবীন্দ্র জয়ন্তী হয় জেনে। কি করে তাদের বোঝাবো যে, বাংলাদেশে এগুলো শুধু জাঁক যমক করে হয়ই না, আনন্দে আপ্যায়নে এগুলো ছাড়িয়ে যায় কলকাতাকেও। অর্ণব বাবু যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন তবে পয়লা বৈশাখের দিনটিতে কি অপরূপ সাজে বাংলাদেশ সজ্জিত হয়, তা নিজ চোখে দেখে আসার আমন্ত্রণ রইল। দেশ বিদেশের পত্র-পত্রিকায় কেবল বাংলাদেশ বলতে টুপি দাঁড়ি ওয়ালা লোকের ছবি সম্বলিত মৌলবাদী চেহারাটাই প্রকাশিত হয়। হ্যা, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে মৌলবাদের বাড় যে বেড়েছে তা তো কেউ অস্বীকার করবে না। আমরা মুক্তমনারা তো সে জন্য আমাদের শংকা আর প্রতিবাদ প্রকাশ করছিই। কিন্তু বাংলাদেশে পাশাপাশি চিরায়ত 'স্যেকুলার' বাঙলী উৎসব আর অনুষ্ঠানাদি আয়োজনেরও যে কোন বিরতি নেই, সেগুলো আয়োজন করার মত লোকজনেরও যে অভাব নেই, সেটিও পাশাপাশি জানিয়ে দিতে চাই।

আবারো রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ফিরে যাই। আমি আগে অনেক সময়ই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেছি বিশেষতঃ নারী বিষয়ে তার প্রথাগত ধ্যান ধারণার। কিন্তু কখনই রবীন্দ্রনাথকে ভিনদেশী ভেবে করিনি। সমালোচনা যা করেছি নিজেদের আত্মার অংশ ভেবেই। কিন্তু মুক্ত-মন নিয়ে রবীন্দ্র সাহিত্য বা দর্শনের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করা এক জিনিস আর জেহাদী জোশে রবীন্দ্রনাথকে স্রেফ 'হিন্দু কবি' বানিয়ে সংস্কৃতি থেকে হটানোর অপচেষ্টা অন্য জিনিস। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথকে হটানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। কারণ পাকিস্তানপন্থীদের কাছে উনি হিন্দু কবি, ভারতীয়। ঠিক একইভাবে স্বাধীনতার পর জিয়া-মোস্তাকের উত্তরসুরীরা স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে জিকির তুলেছেন জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে। তারা কবিগুরুর বানী 'আমার সোনার **বাংলা**'র মধ্যে আর বাংলাদেশের স্বকীয়তা খুঁজে পান না। এরা ভুলে যান, মুক্তিযুদ্ধের সময়ও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় **বাংলা**' ধ্বনি দিয়েই বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলেন। এতে আমাদের জাতিসত্ত্বা বিকিয়ে যায় নি। বাংলাদেশ থেকে রবিঠাকুরকে ত্যাজ্য করতে পরামর্শ দেওয়ার

আগে অর্ণব দত্তকে আরেকবার যুক্তিগুলো ভেবে দেখতে পরামর্শ দেই, তিনি আসলে প্রকারন্তরে কাদের হাত শক্তিশালী করছেন।

অনাকাংখিত বিতর্কের কারণে কারো মনে কোনরকম আঘাত করে থাকলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

২৭ এপ্রিল, ২০০৬